# একক : ২৩ : জাতপাত— গুরুদাস ভট্টাচার্য

গঠন

২৩.০ উদ্দেশ্য
২৩.১ প্রস্তাবনা
২৩.২ মূল পাঠ : ১ম অংশ
২৩.৩ সারাংশ
২৩.৪ মূল পাঠ : ২য় অংশ
২৩.৫ ২য় অংশের সারাংশ
২৩.৬ মূল পাঠ : ৩য় অংশ
২৩.৭ ৩য় অংশের সারাংশ
২৩.৮ মূল পাঠ : ৪র্থ অংশ
২৩.৯ ৪র্থ অংশের সারাংশ
২৩.১০ নির্বাচিত পাঠ
২৩.১১ উত্তর সংকেত

## ২৩.০ উদ্দেশ্য

সমাজতত্ত্ব নৃতত্ত্ব এই সব বিষয়ের রচনায় ভাষার যে বৈশিষ্ট দেখা যায় তার সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে জাতি ধর্ম ইত্যাদির মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গি গড়ে ওঠে এই আশা নিয়েই এই রকম পাঠের অবতারণা করা হয়েছে।

- জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করতে পারবেন।
- জাতিভেদের বড় শত্রু অন্ধ কুসংস্কার যা অবৈজ্ঞানিক তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

## ২৩.১ প্রস্তাবনা

এই পাঠে গুরুদাস ভট্টাচার্যের লেখা 'জাত পাত' প্রবন্ধটির কিছু অংশ দেওয়া হল। এই প্রবন্ধটিতে লেখক 'জাতি ভেদের' অবৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং তার বিরুদ্ধে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনা করেছেন। জাতপাতের সপক্ষে যে নানারকম ঐতিহাসিক

এবং সমসাময়িক ধারণা আছে তা এক এক করে তুলে ধরে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সেগুলির খন্ডন করা হয়েছে। লেখক, শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও জাতি-বিভেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ভিত্তির বিশদ ব্যাখ্যা করার পর তার কড়া সমালোচনাও করেছেন।

এই ধরনের বিষয় নিয়ে লেখা রচনার ভাষা স্বাভাবিক কারণেই সাধারণত কঠিন হয়ে থাকে। প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হয়। লক্ষ করা যেতে পারে যে এই রচনাটিতে তৎসম শব্দের ব্যবহার তো হয়েছেই কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি, ফারসি এবং অন্যান্য বিদেশি শব্দও অনেক পাওয়া যাবে।

এই পাঠটি চারভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের পরে অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে।

---

## ২৩.২ মূল পাঠ : প্রথম অংশ

---

চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই জানেন, দুজন মানুষ হুবহু একই রকম দেখতে হয় না। প্রত্যেকেরই গড়ন-পেটনে এমন ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে, যা তার বাপ-পিতামহের কাছ থেকে পাওয়া। তবে, পরস্পর প্রায় একই ধাঁচের, একই আদলের— এমন লোক হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়; এবং এই জাতীয় 'সদৃশ' ব্যক্তিবর্গ নিয়ে যে 'গোষ্ঠী' তাকে বলা হয় 'জাতি' (Race)। এক জাতির সঙ্গে আরেক জাতির পার্থক্যটা শুধু দেহের দিক থেকে নয়, সামাজিকও বটে। অর্থাৎ কোনও কোনও জাতি সভ্যতার দৌড়ে অনেক এগিয়ে গেছে। অন্যরা পেছনে পড়ে আছে কমবেশি। এই যে সামাজিক তথা অর্থনৈতিক বৈষম্য, এরই বুকে জন্ম নেয় 'জাত-জালিয়াতি', 'জাতের নামে বজ্জাতি' 'জাতি-বৈর' বা 'জাতি-বিদ্বেষ' নামক জারজ ও বিষাক্ত চেতনাটি তার কন্টকাকীর্ণ ডালপালাসমেত।

ধর্মও এর ভিত্তিভূমি নয়। কারণ, কোনও সৎধর্মই দৈহিক বিভিন্নতাকে কানাকড়ি দাম দেয় না; তার দৃষ্টিতে : মানুষে মানুষে পরমাত্মীয়, যেহেতু ঈশ্বরের সামনে সবাই সমান। খ্রিস্টতন্ত্র শুরু থেকেই জাতিবিদ্বেষ-বিরোধী। নিউ টেস্টামেন্ট- এ উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত হয়েছে বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহাবাণী। সন্ত পল বলছেন, 'সব মানুষের দেহে বইছে এক রক্ত'। খ্রিস্টীয় সন্ত তালিকার সাদা-কালো-হলদে তিন রঙের মানুষেরই সাক্ষাত পাওয়া যায়। ইসলামের দৃষ্টিতেও সব মুসলিম সমান। মুসলমান জাতিভেদ প্রথাকে কখনও প্রশ্রয় দেয় না। ভারতের ঋষিরাও একদা নিঃসংকোচে ঘোষণা করেছিলেন, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'।

এ যেমন একদিকের ছবি, তেমনি অন্যদিকে এর উল্টো ছবিও আছে। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই। 'মানুষে-মানুষে এবং জাতিতে-জাতিতে দেহের ও মনের যে স্বভাবজ পার্থক্য, তা জন্মগত, বংশগত এবং অপরিবর্তনীয়'— এই বিশ্বাস উচ্চারিত হয়েছে ওল্ড টেস্টামেন্টের আদি খন্ডে। প্রায় চারহাজার বছর আগে, মিশরের ফারাও তৃতীয় সেসট্রিমের রাজ্যে নিগ্রোদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। হতে পারে, রাজনৈতিক

কারণে। এর হাজার দুয়েক বছর পরে জাগ্রত সুসভ্য গ্রিকরা মনে করত, "যারা গ্রিক নয়, তারা বর্বর'। মজার কথা একই সময়ে পার্সিরাও ভাবত, "আমরাই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাত'। আরও মজার ব্যাপার ছিল, গ্রিসেই বিশ্ববিখ্যাত পন্ডিত অ্যারিসততল ফতোয়া জারি করলেন, বিশ্বের বিধান এই যে, বিশেষ কিছু লোক (অর্থাৎ গ্রিকরা) জন্ম থেকেই স্বাধীন। বাদবাকি সব (অর্থাৎ অ-গ্রিকরা) আজন্ম দাসানুদাস'। জ্ঞানী সিসেরো এর প্রতিবাদ করলেন সরবে, 'সব জাতিই সজাতি অর্থাৎ সমান।' আবার, এই সাম্যদ্রষ্টা সিসেরোই ব্রিটেনের কেল্‌টদের 'অশিক্ষিত হতভাগা অধমাধম' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কত ঠুনকো সব মহাজনদের অমৃতভাষণ।

রোমানরা ব্রিটেনদের, নর্মানরা স্যাকসনদের, ইউরোপীয়রা আফ্রিকানদের ঘৃণা করত। এরকম নিদর্শন অসংখ্য ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। তবে, এর সবগুলোই যে জাতিবিদ্বেষের ফল, তা নয়। অনেকগুলোই সাংস্কৃতিক বা ধর্ম-বিরোধের ফল। সেগুলো তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু জাতিবিদ্বেষ অমানুষিক। সাংস্কৃতিক দূরত্ব কমিয়ে আনা যায়, ধর্ম-বিরোধও মিটিয়ে ফেলা যায়; কিন্তু জন্মপত্রিকা বিচার করে বা দেহের মাপজোক করে যে জাতিবৈর, তার দাগ কোনওক্রমেই মুছে ফেলা যায় না।

ইতিহাসের তথ্য: জাতিবিদ্বেষ নামক সংস্কার তথা কুসংস্কার পঞ্চদশ শতকের আগে কোথাও ছিল না; ওই ধরনের জাত-বেজাতের ভাগাভাগি কারও মাথাতেই তখনও আসেনি। এর জন্ম ইউরোপীয় বণিকদের জাহাজের-মগজে, আফ্রিকা আমেরিকা-ভারতে উপনিবেশ স্থাপনে, সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী লালসায়, 'ভাগ করে ভোগ করো' শ্লোগানের মাধ্যমে। প্রচলিত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে স্পেনীয় শাসকগোষ্ঠী লাতিন আমেরিকায় বর্ণভেদ-প্রথাকে তীব্রতর করে তুলেছিল ক্রীতদাস-ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য। অ্যারিসততলের দাসতত্ত্বের দোহাই দিয়ে ঘোষণা করেছিল, 'আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা বাঁদরের জাত'। ভারতে ইংরেজের ভূমিকা কারও অজানা নয়। যার ফল আমরা আজও ভোগ করছি। অবশ্য, সেই বীভৎস লুঠপাটের দিনেও সৎ স্পেনীয় ছিলেন, যাঁরা মানুষকে মানুষই মনে করতেন। এঁদের সমর্থন করেছিলেন মতেঈ রুশ্যো-ভলত্যের-রুফোঁ প্রভৃতি। বিপরীত শিবিরে বসে দার্শনিক হিউম লিখলেন, 'সাদা চামড়াদের তুলনায় নিগ্রোরা অবশ্যই নিকৃষ্ট'। এবং শিবিরে তিনি একা ছিলেন না।

এরই জের ধরে গোটা অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতক মানবপ্রেম ও জাতিবিদ্বেষ মুখোমুখি—একদিকে ফরাসি ও আমেরিকান বিপ্লব, ইংলন্ডে দাসপ্রথা- বিরোধী আন্দোলন; অন্যদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে 'তুলোর রাজ্যপাট'-এ মজবুত শ্রমিক-দাসত্ব, পথে-প্রান্তরে সাদাদের বুলি, 'কালোরা জানোয়ারদেরই জাত, শুধু একটু অন্যজাতের এইমাত্র।' বুলির সমর্থনে নিয়ে আসা হল বিজ্ঞানকে, ডারউইনের আবিষ্কারকে। তাঁর বিনা অনুমতিতেই।.

ডারউইন দেখেছিলেন: প্রাণীজগতে তারাই টিকে থাকে, যারা যোগ্য, যারা পরিবেশকে মানিয়ে নিতে পারে। এর নাম তিনি দিয়েছিলেন 'যোগ্যতমের উর্দ্বতন।'

সাম্রাজ্যবাদী শোষণমুখী 'দস্তর সভ্যতা' লুফে নিল তত্ত্বটাকে। ব্যাখ্যা দিল : 'জোর যার, মুলুক তার'। অর্থাৎ দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, 'নীচু'-দের ওপর 'উঁচু-দের আধিপত্য-এ হল প্রাকৃতিক নিয়ম ; পররাজ্যগ্রাস মহৎ কর্ম ; অযোগ্যদের বিলোপেই সমাজের অগ্রগতি। বেচারি ডারউইন। তাঁর জৈবিক বিবর্তনবাদ'—কে খোল নলচে বদলে নয়া নাম রূপ দেওয়া হল, 'সামাজিক বিবর্তনবাদ' ; আর, সেই 'বাদ' এর কাঁধে চেপে কায়েমি স্বার্থবাদীরা দাপটের সঙ্গে দুনিয়ার তাবৎ মধু পান করে চলল নিরবধি।

পুনশ্চ : অপবিজ্ঞানের কুব্যবহার বুমেরাং-এর মতো ফিরে এল প্রয়োগকারীর কাছেই। 'সামাজিক ডারউইনবাদ' এতদিন কালা-ধলাদের আলাদা করতেই ব্যবহৃত হচ্ছিল ; অতঃপর সেই একই খড়্গো কাটা পড়ল বলারাও- বলা বাহুল্য, গরিব ধলারা। এরিখ সুসল্যন্ড উদ্ধত মন্তব্য করলেন, 'ধনীরাই বর্ণশ্রেষ্ঠ, নির্ধন মাত্রই বর্ণহীন, অপকৃষ্ট ; বোমা মেরে ওদের উড়িয়ে দিলে তবেই এ-জাতটার উন্নতি হবে।' আলেকসিস ক্যারল স্বজাতির গরিবদের সোজা ছেঁটে দিলেন মানুষের তালিকা থেকে। জাতিভেদ ঘুরে এসে দাঁড়াল আত্মভেদে, স্বজাতি বিদ্বেষে! এ বিদ্বেষ আজ এমনই দৃঢ়মূল যে বিজ্ঞান ও যুক্তির কোনও কথাই এদের কানে ঢোকে না। বরং একে এরা চিরস্থায়ী করে রাখতে চায়, বিঁধিয়ে-বিঁধিয়ে ঢুকিয়ে দিতে চায় মানুষের অন্তরে। তার জন্য কত সংস্থা-পত্রিকা, রাজনীতি-কূটনীতি, মানবতাবিরোধী চক্রান্তের কালো ছায়া। দেশ-কাল পাত্র ভেদে তার রূপ, রূপান্তর, বিচিত্র চরিত্র।

## ২৩.৩ সারাংশ

জাতিভেদ সংস্কার ধর্মভিত্তিক নয়। কারণ, হিন্দু, খ্রিস্টীয়, মুসলমান-প্রত্যেক ধর্মই মূলত বিশ্বাস করে যে 'ঈশ্বরের সামনে সবাই সমান।' ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দুরকম মতবাদের সাক্ষাত পাই। একদিকে কিছু লোক বিশ্বাস করেন যে গায়ের রং, চেহারা, ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষই জন্মগতভাবে একে অন্যের সমান-কেউ কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ অথবা অধম নয়। রুশ্যো, ভলত্যের, মতেঈঁ রুফোঁ প্রভৃতি দার্শনিক এই দলে পড়েন, বিপরীত শিবিরে আছেন অ্যারিসততল এবং হিউম এর মতো কিছু দার্শনিক যাঁরা ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর এই বক্তব্যে বিশ্বাস করেন যে, 'মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে দেহের ও মনের যে স্বভাবজ পার্থক্য তা জন্মগত, বংশগত এবং অপরিবর্তনীয়। এই মতবাদের দোহাই দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের খাতিরে বর্ণভেদ প্রথাকে তীব্রতর করে তুলেছেন। তাঁরা ডারউইনের বিজ্ঞানভিত্তিক 'জৈবিক বিবর্তনবাদ'-এর মতো থিয়োরিকেও নিজেদের স্বার্থে সুবিধেমতো ব্যাখ্যা করেছে

এবং 'সামাজিক বিবর্তনবাদ-এর নামে দরিদ্র এবং দুর্বলদের নিপীড়ন করে চলেছে। এই মতবাদে বিশ্বাসীর জাতিভেদ বিদ্বেষ এতই দৃঢ়মূল যে বিজ্ঞান ও যুক্তির কোনও কথাই এদের কানে ঢোকে না।

## অনুশীলনী- ১

**নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ৬৪ নং পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।**

**১) নিচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে X চিহ্ন দিয়ে দেখান।**

**ক) এক জাতির সঙ্গে আরেক জাতির পার্থক্য শুধু চেহারার দিক দিয়েই নয় বরং সামাজিকও বটে।** ☐ ☐

খ) প্রত্যেক ধর্মই আসলে জাতিবিদ্বেষ বিরোধী। ☐ ☐

গ) আরিসততল বলেছিলেন যে 'সব জাতিই সজ্জাতি অর্থাৎ সমান।' ☐ ☐

ঘ) জাতিবিদ্বেষ নামক সংস্কার পঞ্চদশ শতকের আগেও ছিল। ☐ ☐

ঙ) স্পেনের শাসকরা লাতিন আমেরিকায় বর্ণভেদ প্রথার সমর্থন করেছিল ক্রীতদাস ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য। ☐ ☐

চ) মতেস্কঁ, রুশ্যো, ভলত্যের, রুফোঁ— এই চারজন দার্শনিক জাতিভেদ ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। ☐ ☐

ছ) হিউম-এর বক্তব্য ছিল যে 'সাদা চামড়াদের তুলনায় নিগ্রোরা অবশ্যই নিকৃষ্ট'। ☐ ☐

জ) ডারউইনের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' থিয়োরিটির আসল মানে হল 'জোর যার, মুলুক তার'। ☐ ☐

ঝ) স্বার্থবাদীরা ডারউইনের 'জৈবিক বিবর্তনবাদ'কে ভিত্তি করে 'সামাজিক বিবর্তনবাদদের' প্রবর্তন করলেন। ☐ ☐

ঞ) জাতিভেদ বিশ্বাসী লোকেরা বিজ্ঞান ও যুক্তির কথা মেনে চলেন। ☐ ☐

## ২৩.৪ মূল পাঠ: দ্বিতীয় অংশ

মূল চেহারা ও চরিত্র সর্বত্রই এক-নামটাই শুধু আলাদা আলাদা। কোথাও নিগ্রো বিদ্বেষ, কোথাও ইহুদি-দ্বেষ, কোথাও এশিয়া-বৈর, কোথাও বা আর্যামির মতো আস্ফালন। শুধু রক্ত নিয়েই কত রক্তারক্তি।

ক) নীল রক্ত ; কালো রক্ত

'জাতি বলতেই বোঝায় এমন এক একটি নরগোষ্ঠী যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরস্পর সাদৃশ্য আছে ; যেমন চুলের বা চোখের রং, নাকের ডোল দেহের গড়ন। বিজ্ঞান বলে : এগুলো এক একটা ধরে বাছাই করতে গেলে 'এক জাতের মানুষ' পৃথিবীর কোথাও মিলবে কিনা সন্দেহ। আদিম মানুষ ছিল যাযাবর, গোষ্ঠীর পর গোষ্ঠী কেবলই ঠাঁই বদল করত, এক গোষ্ঠীর সঙ্গে আরেক গোষ্ঠীর লড়াই-মিলমিশ ছিল প্রাত্যহিক ব্যাপার। প্রত্নতাত্ত্বিক কঙ্কালের মাপজোক নিয়ে প্রমাণিত হয়েছে : নিয়ানডার্থালদের সঙ্গে ক্রো-ম্যাগননদের, নিগ্রোচটুর সঙ্গে মঙ্গোলদের হামেশাই দহরম-মহরম চলত। বড় বড় সভ্য দেশগুলি বিদেশিদের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়েছে, ভেঙে পড়েছে তাদের আভ্যন্তরীণ কাঠামো, নিবাসী-প্রবাসী মিলে নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ, প্রাচীনতম কাল থেকেই জাতি-মিশ্রণ চলে আসছে অবাধে, ধারাবাহিকভাবে। এবং তার ফলে কারও যে অধঃপতন হয়েছে, এমন খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

কিন্তু চোরা না শোনে ইতিহাসের সত্য। তারা সমানে চিৎকার করে চলেছে : ছিল। 'একদা পৃথিবীর বুকে বিচরণ করত বাঘা-বাঘা সব 'বিশুদ্ধ জাতি।' তখন ছিল সত্যযুগ। তারপর এল ঘোর কলি—জাতে-জাতে মেশামেশি। ফল : মানব সমাজের অধঃপতন। তখন থেকেই ওদের শরীরের বিকৃতি ঘটতে লাগল, যন্ত্রগুলি দুর্বল হয়ে উঠল। আধিব্যাধি হল নিত্যসঙ্গী। যত মিশ্র-বিবাহ, ততই অধঃপাত-বিকৃতি-অসুখ।'— বলা বাহুল্য, আত্মপক্ষ সমর্থনে এঁরা কোন বাস্তব তথ্য বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণপত্র পেশ করেননি। এঁদের আশ্রয় ও হাতিয়ার দুর্মর সংস্কার। 'মানব' নামক মহাজাতি স্বতন্ত্র বিশুদ্ধ জাতিতে বহুধা-বিভক্ত—অবিশ্বাসের জড় সুপ্রাচীন 'রক্ত-তত্ত্ব'। আজও প্রচলিত উক্তি : 'নীল রক্ত, নতুন রক্ত, রক্তের সম্বন্ধে' ইত্যাদি সবই ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক। উত্তরাধিকার এমন একটা তরল পদার্থ নয় যে রক্তের প্রভাবে প্রসূত হবে। মা-বাপের রক্ত নবজাতকের দেহে সঞ্চারিত হয়—এও বিজ্ঞানসম্মত নয়। ভ্রূণ প্রথম দিন থেকেই নিজের রক্ত নিজের তৈরি করে নিতে থাকে। তার সঙ্গে বাপ-মায়ের রক্তের রক্তের গ্রুপ নাও মিলতে পারে, আবার অজানা লোকের দেহজ রক্তের গ্রুপ মিলে যেতে পারে। নতুবা, ব্লাড ব্যাঙ্কের প্রয়োজনই হত না। সুতরাং 'জর্মন রক্ত', 'হিন্দু রক্ত'-এ জাতীয় অভিধার কোনও অর্থই হয় না। বস্তুত, পৃথিবীর তাবৎ জাতিই সংকর। এই সঙ্গে, পরীক্ষা করে এও দেখা গেছে, যে-সমাজে অসগোত্র বা অসবর্ণ বিবাহ অচল, সেখানেই সমাজ মিয়গামী ; যেখানে মিশ্র-বিবাহ ব্যাপক, সেখানে পরিবার-দেহে নতুন তেজ সঞ্চালিত হয়, নতুন শক্তি জেগে ওঠে। জাতি মিশ্রণেই সভ্যতা এগিয়ে যায় নব-নবীন দিকে-দিগন্তে।

কিন্তু এ-সত্য বর্ণাভিমানীরা মানতে চায় না। আমেরিকার মতো বিজ্ঞানে উন্নত দেশেও অভিজাতরা 'নীল রক্ত', নিগ্রোরা 'কালো রক্ত'। অথচ এই আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রেই পৃথিবীর কত জাতের মানুষ যে 'একদেহে হল লীন', যার ফলে ইউ.এস.এ. আজ পৃথিবীর অন্যতম মহাশক্তি।

## ২৩.৫ দ্বিতীয় অংশের সারাংশ

ইতিহাস এবং প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষা ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে প্রাচীন কাল থেকেই অবাধে এবং ধারাবাহিক ভাবে জাতি মিশ্রণ চলে আসছে। এই মিশ্রণের ফল কখনও কোনও সমাজের অধঃপতনের কারণ হয়েছে বলে জানা যায়নি। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে পৃথিবীর সব জাতিই সংকর। তাই 'বিশুদ্ধ জাতি' বলে কিছু নেই। কিছু সংখ্যক লোক এই তথ্যে বিশ্বাস করে না, তাই তারা সংস্কারবশত চিৎকার করে যায় যে বর্ণসংকরের ফলেই মানব সমাজের অধঃপতন হয়েছে। সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতামত হল যে বর্ণসংকর জাতি সমাজকে নিম্নগামী না করে বরং তাকে নতুন শক্তি এবং তেজ দেয়। 'বিশুদ্ধ-জাতি'-র সমর্থকরা এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনতে রাজি নন।

## দ্বিতীয় অংশের অনুশীলনী—২

**নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ৬৪ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।**

**১) নিচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট করে (X) চিহ্ন দিয়ে দেখান।**

**(ক) বিজ্ঞান বলে যে দৈহিক সাদৃশ্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, পৃথিবীর কোথাও 'এক জাতের মানুষ' বোধহয় পাওয়া যাবে না** ☐ ☐

(খ) আদিম যাযাবর মানুষ কখনও অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারত না। ☐ ☐

(গ) প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রমাণ করেছেন যে আদিম নিয়ানডার্থালদের সঙ্গে ক্রো-ম্যাগননদের মেলামেশার দরুন বর্ণসংকর হয়েছিল। ☐ ☐

(ঘ) শিশুর রক্তের গ্রুপ সব সময় উত্তরাধিকার সূত্রে মা-বাপের কাছ থেকে পাওয়া। ☐ ☐

(ঙ) অসবর্ণ অথবা মিশ্র বিবাহের দরুন জাতির এবং সমাজের অধঃপতন হয়। ☐ ☐

## ২৩.৬ মূল পাঠঃ তৃতীয় অংশ

'নিগ্রোরা পশুরও অধম...:ইহুদিরা অমানুষ....জাতিমিশ্রণ অধঃপাতের পথ-এসবের

উল্টো পিঠের শ্লোগান হল— 'আমরা আর্য...আমরা নর্দিক...আমরা প্রভুর জাত'।

**অ. আর্যত্বের উদ্ভব:** সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন, জর্মন, কেলটীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা লক্ষ করেছিলেন উইলিঅম জোন্‌স্‌ (১৭৮৮)। এদের সঙ্গে আরও কয়েকটি ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ করলেন টমাস ইয়ং। সকলের আদি উৎসের নাম দিলেন 'ইন্দো-য়োরোপীয় ভাষা' (১৮১৩)। "ভাষা যখন একটা ছিল, তখন জাতও একটা নিশ্চয় ছিল'- এই কারুতালীয় যুক্তিতে কল্পনা করা হল 'ইন্দোয়োরোপীয় জাতি।' কিছু পন্ডিত বললেন— ওটা হবে 'ইন্দো-জর্মন'। ম্যাকসম্যুলর 'আর্য' শব্দটি চালু করে দিলেন; 'আর্যভাষা' থেকে জন্ম নিল 'আর্যজাতি'-যারা নাকি হিন্দু-পারসিক-গ্রিক-রোমান-কেল্ট-জর্মনদের আদি ও অকৃত্রিম পূর্বপুরুষ! নাম যা-ই হোক, জাত যখন একটা বার করা গেছে তখন সেই আদি পিতাদের বাসস্থানও একটা নির্দিষ্ট করতে হয়! কেউ বললেন, ওদের জন্মভূমি মধ্য এশিয়া; কেউ বললেন, হিন্দুকুশের অধিত্যকা। কোন পন্ডিত আর্যদের নিয়ে গেলেন কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরে। অন্য পন্ডিত তাদের সরিয়ে আনলেন বালটিক সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে। একজন বললেন পশ্চিম আফ্রিকা, অন্যজন হাঁকলেন উত্তর য়োরোপ, আরজন হাঁকড়ালেন দক্ষিণ রাশ্যা। এইভাবে পন্ডিতদের গবেষণা-চক্রে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম ঘুরতে ঘুরতে আর্যরা আপন বাসা আর কোনদিন খুঁজে পেল না। তখন তাদের দেবতা বানিয়ে স্বর্গে পাঠানো ছাড়া নান্য পন্থা।

**আ. টিউটনবাদের দম্ভ:** আরম্ভটা হয়েছিল 'জর্মন-রক্ত অভিজাত' এই চিৎকার দিয়ে, প্রবক্তা কাউন্ট বুলেভিল (১৬৫৮-১৭২২)। পরিপূর্ণ রূপ দিলেন ফরাসি গবেষক গোবিন্যু, প্রায় একশো বছর পরে। নিজ বংশের আভিজাত্য প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তিনি গবেষণা শুরু করেছিলেন, ঠেকলেন এসে আর্যতত্ত্বে; সিদ্ধান্ত করলেন: গোটা শ্বেতাঙ্গ সমাজ নয়, আর্য হল একমাত্র তারাই, যারা সমাজে চূড়ামণি, যাদের জন্ম হয়েছে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ে। অতঃপর তাঁর উপসিদ্ধান্ত—সর্বহারা জর্মন আদৌ আর্য নয়, হতে পারে না। গোবিন্যুর সবচেয়ে বড় শার্গিদ বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ভাগনার। পরে, অন্যান্য দেশেও তাঁর সাগরেদ জুটতে থাকে।

১৮৭০-এ ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার লড়াই ও তার প্রতিক্রিয়ার 'আর্যামি' রূপ নিল একটি সুবিদিত দার্শনিক তত্ত্বের। তত্ত্বের দাপটে 'বর্ণশ্রেষ্ঠ সমাজ'-এর অর্থবিস্তার ঘটল, হল 'বর্ণশ্রেষ্ঠ জাতি'। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, দুটোই ভ্রান্ত দর্শন। কিন্তু অপবিজ্ঞানী বেপরোয়া, রাজনীতিবিদ চতুর, গোঁড়ারা উচ্চকণ্ঠ: সভ্যতার তামাম অগ্রগতির মূলে একমাত্র তাদেরই জাত অর্থাৎ আর্যরা। বড় বড় সভ্যতা, মহৎ কীর্তিকলাপ, সবকিছুর মূলে নর্দিক; এমন কী চীনে মঙ্গোলীয় সভ্যতা সম্ভব হয়েছিল 'আর্য রক্ত'-র অনুপ্রবেশে।

শেষ মন্তব্যটি গোবিন্যুর। তিনি আর্য নামক এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের

কথা বলেছিলেন। তাদের চেহারার কোনও বর্ণনা তিনি দেননি। সে কাজ সমাধা করল তাঁর শিষ্যরা। বলল, আর্যরা হচ্ছে দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, নীলনয়ন, সুকেশ, বীর, তেজস্বী, মহৎ—এক কথায় নেতাসুলভ গুণাবলীর আইফেল টাওয়ার। এই অবকাশে ভাগনার-জামাতা চেম্বরলেন আমদানী করলেন শব্দটি- 'টিউটন'। নয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হল— টিউটন অর্থাৎ ব্লনড জর্মনরাই য়োরোপের যা কিছু ভাল-গ্রিক ও রোমক সভ্যতা, পোপ সাম্রাজ্য, রেনেশাঁস, ফরাসি বিপ্লব—সমস্তের একমেব জনক ; আলেকজান্দার, সীজর, দ্য ভিঞ্চি, গ্যালিলিও, ভলত্যের, বেকন, নেপোলিয়ন, মার্কো পোলো ; ওয়ার্ট, গ্যলভানি, লাভসিয়ে—লাইন করে সবাই টিউটন! এমন কী এদের আসল নাম যে জর্মনে ছিল, তা পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়ে গেল। দান্তে, শেক্সপিয়র, রাফ্যেল, মাইকেল এঞ্জেলো— এঁদের এভাবে ম্যানেজ করা গেল না, রাখা হল দোঁ আশলার দলে ; ফতোয়া দেওয়া হল ; এঁদের কালো রক্তে টিউটনীয় টোনড রক্ত অবশ্যই মিশেছিল, নইলে তো এই সূর্যতারা সকলই নিষ্ফল! ওয়ল্ট্ম্যান্ আর এক কদম এগোলেন— 'যীশু খিস্টের বাবা-মা যে ইহুদি তার কোনও প্রমাণ নেই। কারণ—প্রথমত, তাঁর পিতা ছিল না, জোসেফ তো ননই। দ্বিতীয়ত, গ্যালিলিয়ার অধিবাসীদের দেহে আর্য রক্ত নিশ্চয়ই ছিল। তৃতীয়ত, যীশু যে আর্য ছিলেন, তাঁর বাণীই তার প্রমাণ। এইভাবে ইতিহাসকে, বিজ্ঞানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চতুর বাকজালে আর্যদের টিউটনদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রাণপণ চেষ্টা চলতে লাগল। জর্মনদের নাক ফুলে উঠতে লাগল, মাথা হয়ে উঠল গরম। কিন্তু যেই নাৎসিদের সঙ্গে বিরোধ বাধল চার্চের, তখন সব চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল, 'যীশু খ্রিস্ট আর্য' এ-কথা ঘুণাক্ষরে উচ্চারণেরও সাহস হল না কারও!

**ই. নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ :** চেম্বারলেন, ভাগনার, ওয়ল্ট্ম্যান, গেন্কা প্রভৃতির অক্লান্ত চেষ্টায় জর্মনিতে 'আর্য বা টিউটন' জাতির শ্রেষ্ঠতার ধারণাটি বেশ জমে বসে গেল, প্রায় ধর্মবিশ্বাসের মতোই। প্রচারগুণে, নতুন নতুন তত্ত্ব জন্মাতে লাগল। রাইমার ফতোয়া দিলেন— জর্মন সমাজকে ভাগ করা হোক তিন বর্ণে— বিশুদ্ধ, আধা বিশুদ্ধ, ভেজাল জর্মন। গুন্থার উবাচ, নর্দিকরা হল উঁচু স্তরের অপরাধী, আলপাইনদের মতো ছিঁচকে চোর নয়।' গ্যচ উবাচ, 'দুনিয়ার দুটোই মাত্র জাত-নর্দিক এবং জানোয়ার।' এই ভাবনার উত্তরাধিকারী 'মেইন ক্যাম্ফ্-এর লেখক হের হিটলার লিখলেন (১৯২৫) : 'ইতিহাস সাক্ষী, আর্য রক্তে যখনই নিম্নবর্ণের রক্ত এসে মিশেছে, সভ্যতা-কে-সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে।...যেসব জর্মন গোষ্ঠী অদ্যাবধি বিশুদ্ধ থেকে গেছে, তারাই আজ প্রভুত্ব করছে আমেরিকায় ; যতদিন নির্ভেজাল থাকবে এরা, ততদিনই রাজাগিরি করে যাবে।' অস্যার্থঃ লাতিন আমেরিকায় জাত-বেজাত মিশে গেছে, আর্য-জর্মনের পদতলবাসী হওয়াই তাদের ললাটলিখন অখন্ডনীয়।-১৯৩৬-এর বার্লিন অলিম্পকে বিখ্যাত দৌড়বীর আমেরিকান কৃষ্ণকায় জেসী ওয়েন্স্, তাঁরই

দেশে, দেশবাসীর সামনে, চার-চারটে সোনার পদক ছিনিয়ে নিয়ে হিটলারের বিষদাঁত ভেঙে দিলেন ; তারপর প্রতিযোগিতা শেষে জেসী এবং আরও ন'জন নিগ্রো মিলে আটটা সোনার, তিনটে রূপোর, দুটো ব্রোঞ্জের পদক ঝুলিতে ভরলেন যখন, মহামহিম ফ্যুররের জন্য তখন অক্সিজেন সিলিন্ডার অর্ডার দিতে হয়েছিল ! তবু রক্তবীজ ফিরে বেঁচে ওঠে, এদেশে এবং অন্যদেশেও, খোদ আমেরিকাতেই বহবাস্ফোট করে হিটলারের চেলা : 'নিগ্রোরা বাঁদরদের সগোত্র।' এদের দিলের দোস্ত ইংলন্ডের মহাপণ্ডিতদের মহতী গবেষণা : টিউটনরা ব্রিটেন আক্রমণ করে স্থানীয় (অন্-আর্য) অধিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। যার ফলে ব্রিটিশ দেহে 'অসভ্য রক্ত' প্রবেশের প্রশ্নই ওঠে না। এবং ফ্রান্স, সংস্কৃতি সমৃদ্ধ উদারচিত্ত ফ্রান্সে 'কেল্ট্' না 'গল' কে শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে মাথা ফাটাফাটির আজও কামাই নেই।

## ২৩.৭ তৃতীয় অংশের সারাংশ

১৮ এবং ১৯ শতাব্দীতে কিছু য়োরোপীয় ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সাদৃশ্য লক্ষ করে তাদের আদি উৎসের নাম দেওয়া হয় 'ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা'। তারপর 'একভাষা এক জাতি'র যুক্তি দিয়ে কল্পনা করা হয় এক 'ইন্দোয়োরোপীয় জাতি'। পরে এই ভাষা এবং জাতি যথাক্রমে 'আর্যভাষা' এবং 'আর্যজাতি' নামে পরিচিত হয়।

ক্রমশ নানা পণ্ডিত আর্যত্বের নানারকম ব্যাখ্যা করেন। যেমন, ফরাসি গবেষক গোবিন্যুর মতে 'আর্য হল তারাই যারা সমাজে চূড়ামণি, যাদের জন্মই হয়েছে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ে।' এই মতবাদীদের বিশ্বাস যে, পৃথিবীর সব বড় বড় সভ্যতা এবং মহৎ কীর্তিকলাপ ইত্যাদির মূলে রয়েছেন শুধু তাঁরাই যাঁদের শরীরে 'আর্য-রক্ত' রয়েছে। জর্মনিতে 'আর্য জাতির' শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাটি প্রায় অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের মতোই হয়ে উঠেছিল। তাই এই শতাব্দীর গোড়ায়ও হিটলার বলে উঠলেন যে 'আর্য রক্তে যখনই নিম্নবর্গের রক্ত এসে মিশেছে, সভ্যতা-কে-সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। এই সব অবৈজ্ঞানিক ধারণা কিছু প্রভাবশালী লোকের মনে এমনই শেকড় গেড়ে বসেছে যে তারা যুক্তি-তর্ক মানা তো দূরের কথা, চোখের সামনে তথাকথিত 'অনার্য'-দের কৃতিত্ব এবং মহিমা দেখেও মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিজেদের জাতি শ্রেষ্ঠতার অন্ধবিশ্বাসটিকে আঁকড়ে থাকেন।

## তৃতীয় অংশের অনুশীলনী

**নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ৬৪ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।**

**১। নিচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে চিহ্ন (X) দিয়ে দেখান।**

ক) উইলিয়ম জোন্‌স্‌ই প্রথম সংস্কৃত এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা লক্ষ করেছিলেন। ☐ ☐

খ) 'আদিম আর্য ভাষায়' যাঁরা কথা বলতেন তাঁরা সকলে একই জাতির লোক ছিলেন। ☐ ☐

গ) ভারতবর্ষ আর্যজাতির পূর্বপুরুষদের জন্মস্থান। ☐ ☐

ঘ) 'জর্মন রক্ত অভিজাত'-এই অভিমতের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন কাউন্ট বুলেভিল। ☐ ☐

ঙ) বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ভাগনার, গোবিন্যুর সঙ্গে অসহমত ছিলেন। ☐ ☐

চ) 'বর্ণ শ্রেষ্ঠ সমাজ' এবং বর্ণশ্রেষ্ঠ জাতি'-র দর্শন বিজ্ঞান-সম্মতভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। ☐ ☐

ছ) গোবিন্যুর শিষ্যদের মতে প্রাচীন আর্যরা দেখতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং সুন্দর ছিলেন। ☐ ☐

ছ) গোবিন্যুর শিষ্যদের মতে প্রাচীন আর্যরা দেখতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং সুন্দর ছিলেন। ☐ ☐

জ) 'টিউটন' শব্দটি চেম্বারলেন প্রথম আমদানি করেছিলেন। ☐ ☐

ঝ) 'দুনিয়ায় দুটোই মাত্র জাত-নার্দিক এবং জানোয়ার'-এই বক্তব্যটি হিটলারের ☐ ☐

ঞ) হিটলার আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করলেও অন্য জাতির অর্থাৎ অনার্যদের, কৃতিত্বেরও প্রশংসা করেছেন। ☐ ☐

লেখককৃত য়োরোপীয় বানান সাধারণত চলে না প্রচলিত বানান হল 'ইউরোপীয়' এই পাঠে আমরা ইউরোপীয় এই বানান—এর ব্যবহারই করেছি।

## ২৩.৮ মূল পাঠ : চতুর্থ অংশ

হ্যাভেট বলেছিলেন : 'ভাষা ও জাতি দুটি স্বতন্ত্র ধারণা। ভাষার আলোচনায় নৃতাত্ত্বিক শব্দাবলী এবং নৃতত্ত্বের আলোচনায় ভাষা-সূত্র প্রযুক্ত হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়।' স্বয়ং ম্যাক্‌স্‌মুলরও পরবর্তীকালে 'আর্য' শব্দের জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে ভাষাবৈজ্ঞানিক তাৎপর্যের ওপরেই জোর দিয়েছিলেন এবং উভয়ের মেশামেশিকে

পাপকর্ম বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী—ভাষা-জন, জন-জাতি, নেশন শব্দগুলির তারা বেপরোয়া ব্যবহার করে, এক নিশ্বাস উচ্চারণ করে 'শ্লাভ জাতি, লাতিন জাতি, আর্য জাতি'। অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পান্ডিতো ফেঁপে উঠতে থাকে।

একটি মূল ভাষা থেকে একাধিক ভাষা উপজাত হয়েছে, এইরকম ঘনিষ্ঠ ভাষাগুলি নিয়ে 'ইন্দোয়োরোপীয়' বা 'আর্য ভাষা'-পরিবার গড়ে উঠেছে, এবং বাণিজ্য, দেশীয় বা দেশান্তরের মাধ্যমে সে-ভাষা বহু দূর-দূর দেশে ছড়িয়ে পড়েছে— এসবই ঐতিহাসিক তথ্য। এদের একই ভাষা-ভাষী বলা যেতে পারে, কিন্তু একই গোষ্ঠী বা জাতি বলা চলে না। যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মাতৃভাষা একটাই— ইংরেজি ; কিন্তু অধিবাসীরা এক জাতের, এ-সিদ্ধান্ত স্বয়ং আমেরিকানরা মেনে নেবে না।

অর্থাৎ একটা নেশন বা মহাজাতির মধ্যে একাধিক জাতি থাকতে পারে ; অথবা একই জাতি বিভিন্ন নেশনের অঙ্গ হতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপের নানান জাতি আছে, নিগ্রো এবং রেড ইন্ডিয়ানরাও আছে। আবার, উত্তর আমেরিকার কিছু অধিবাসীদের মিল আছে সুইডেন ও ডেনমার্কের লোকেদের সঙ্গে ; দক্ষিণী জর্মনদের দোসর খুঁজে পাওয়া যাবে ফরাসি, চেক ও যুগোশ্লাভদের মধ্যে ; এ-অবস্থায় 'বিশুদ্ধ জর্মন বা অ্যাংলো-স্যাকসন বা আর্য জাতি' বলে হেঁকে ওঠা পাগলামির নামান্তর। তা ছাড়া, করোটির গড়ন এবং অন্যান্য প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করেও দেখা গেছে : তথাকথিত আর্য-দৈহিক ডিজাইন অন্-আর্যদের মধ্যেও বিদ্যমান। আর তীরচাও (১৮৭০-৮০) অনেক আগেই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন— 'আর্য বলতে যে বিশেষ এক টাইপের কথা বলা হয়, তার সাক্ষাৎ আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি।' আর্যামির সমর্থকরাও জানেন, 'আর্য জাতীয়তাবাদ' একটা অপন্ডিতী কল্পনা মাত্র। কেউ কেউ সেকথা স্পষ্ট স্বীকারও করেছেন। অধিকাংশ এসব তর্ক পাশ কাটিয়ে গেছেন। নাছোড়বান্দারা, তার পরেও, গলা উঁচিয়ে শুনিয়ে দিয়েছেন, 'কাজের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। কাজ দিয়ে যিনি নিজেকে জর্মন প্রমাণ করেন, তিনিই জর্মন।' অতএব, সোজা-বাঁকা কোনও ফর্মুলাতে যদি নাও মেলে, তবু দান্তে ও লুথর 'টিউটন টিউটন টিউটন'। এবং নাৎসিরা কোনও ভাণ বা ভাঁড়ামি না করে একদম সোজা হুকুম জারি করল : 'চোখের রং, চুলের কেতা, নাকের লম্বা দিয়ে নয়, কাজ দিয়েই পরিচয়—কে নর্দিক, কে নয়।' এইসব কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে দেহের মাপজোক একটা ছল মাত্র ; মিলে গেল তো বহুৎ আচ্ছা, না মিলল তো ভি আচ্ছা ; প্রবলেম। যেহেতু 'জাতিবিচার বিজ্ঞানের বিষয়ই নয়, ওটা চাক্ষুষ ব্যাপার ; এক নজর দেখলেই চেনা যায়-কে সৎজাত আর কে বদ্-জাত'—ডাঃ গ্রেস হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন (১৯৩৪) : 'কবে বিজ্ঞান জাতি তত্ত্ব আবিষ্কার করবে সেই হাপিত্যেশে রাজনীতি তো আর ঠায় বসে থাকতে পারে না! মানুষে মানুষে রক্তের ভিন্নতা ছিল, আছে,

থাকবে ; জোর যার মুলুক তারই হয়েছে, হবে— এই সত্যই তো গোড়াকার কথা, এবং এই গোড়া ঘেঁষেই রাজনীতি বিজ্ঞানকে অতিক্রম করে যাবে।'

থলি থেকে বেড়াল বেরোল! জাতিদ্বেষের জন্ম বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে নয়, রাজনীতির ল্যাভটরিতে! একই জাতের লোকেরা যখন পরস্পর হানাহানি করে, তখন শুরু হয় 'জাতি নিয়ে বজ্জাতি' ; যখন বিভিন্ন জাতি নিয়ে 'মিত্রপক্ষ' ডানা মেলে তখন 'জাতিতে জাতিতে নাইকো বিভেদ' আবিষ্কারের ধুম পড়ে যায়। যখন মুখদর্শন পর্যন্ত নিষেধ, তখন আর্য-জর্মনের চোখে পীতকায় জাপানি 'অমানুষ' ; আর যখন রাজনৈতিক শয্যাসঙ্গিনী (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে), তখন সরকারি ফতোয়া জারি করতেই হয় : 'জাপানিদের দেহ্ পীতকায় হলেও ওদের দেহে বইছে প্রাচীন শ্বেত 'আয়নাস' বংশীয় পবিত্র রক্ত ; নিপ্পন-নেতা জর্মন-নেতার ভাই-বেরাদর'। হেইল্ হিটলার!

জাতিবিদ্বেষের আর এক ঘাঁটি ব্রিটিশ ভারতেও আর্যামির এই মারাত্মক খেলা লক্ষণীয়। ইংরেজ-জর্মন পন্ডিতগণ একের পর এক যখন প্রমাণ করতে লাগলেন যে ভারতে আর্য নামক এক 'দেবকল্প' জাতির চরণধূলি পড়েছিল কয়েকটি স্তরে, যখন উপনিষদ-বেদ গ্রন্থাদি 'আবিষ্কৃত' হতে লাগল, ঋগ্বেদ স্বীকৃতি হল প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বলে, ইংরেজ-পদানত ভারতীয় হিন্দুদের মনে সঞ্চারিত হল এক নতুন উৎসাহ ও অহংকার, রাজনৈতিক হীনমন্যতাকে চাপা দিয়ে মাথা তুলল সাংস্কৃতিক উচ্চমন্যতা ; জাতি তেজোদৃপ্ত হয়ে উঠল আধ্যাত্মিক তাপে ও ভাপে, যার প্রকাশ উনবিংশ শতকের কণ্ঠে ও রচনায়। উদ্দীপনা অচিরেই পরিণত হল নেশায়, আর্যামির নেশায়—যার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কবিতার তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু নেশায় বুঁদ ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার সর্বাঙ্গে দেখতে পেল 'আর্যত্বের প্রবল ছাপ' : হরপ্পা-মহেন-জো-দাড়োর অলিগলিতে, খিস্টীয় মা-মেরীর বিষণ্ণ প্রসন্ন প্রতিমায়, এমনকী কাবার পবিত্র কৃষ্ণবেদীতেও! নেশায় বুঁদ ভারতীয় অতীতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে বর্তমান বাস্তবকেও গুলিয়ে ফেলল ; বলল : 'আমরাই আর্য, আমরাই হিন্দু'। হিন্দু ধর্ম, হিন্দুজাতি। অতঃপর হিন্দু ভারতীয় যে জাতীয়তার জন্ম দিল, সেখানে ঠাঁই নেই ভারতীয় মুসলমানের, সেখানে বর্ণহিন্দু মহাজনদের পবিত্র বলি অসহায় হরিজন। এইভাবে জাত্যাভিমান থেকে জাতিবিদ্বেষ থেকে বর্ণবৈর থেকে গোত্রভেদ। আরও ভাঙবে। ভাঙতে ভাঙতে ধূল-পরিমাণ হয়ে যাবে। তার ওপর গড়ে উঠবে নতুন সমাজ। তখনই আসবে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, কালান্তর। হয়তো!

## উপসংহার

গোড়াকার কথাটাই শেষে আবার বলি। মানুষে-মানুষে দৈহিক ও মানসিক পার্থক্য একটি বাস্তব ব্যাপার ; একজন হুবহু আরেকজন হতে পারে না ; তেমনি প্রত্যেক

মহাজাতি, জাতি, শ্রেণী, সম্প্রদায়, গোষ্ঠীতে ভাল-মন্দ সগুণ-নির্গুণ উভয় কোটির লোক আছেই ; এ হল জীব বিজ্ঞানের গোড়ার কথা, প্রাকৃতিক নিয়ম ব্যক্তিক বিশিষ্টতা। এই সূত্রকে টেনে বাড়িয়ে, দুমড়ে-মুচড়ে আস্ত একটা জাতিকে বা সম্প্রদায়কে নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠ বা কেবলই নিকৃষ্ট আখ্যা দেওয়ার কোনও অবকাশই এখানে নেই। অন্যপক্ষে, স্ব-বংশ বা স্ব-জাতিকে প্রত্যেকেই ভাবে 'দুনিয়ার সেরা'—তথ্য হিসেবে এটা ভুল, তবে ভাবনাটা সত্যি এবং বহু পুরনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। নতুন যা, তা হল : জীব বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে এই 'মনগড়া' শ্রেষ্ঠতাবোধকে যুক্তিসিদ্ধ করে তোলার চেষ্টা, মানুষকে উঁচু-নীচু, জাত-বেজাতে ভাগে করার কুটনীতি, মিথ্যাকে সত্য বলে দেখাবার চতুর জুয়াখেলা।

গণতন্ত্র বিশ্বাস করে : মানুষের সঙ্গে মানুষের ফারাক আছেই এবং সে কারণেই প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অধিকার, সমান অধিকার। তার লক্ষ্য : প্রতিটি 'গণ' বা ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দান। গণেশতন্ত্র বলে : ঠিক কথা, মানুষে-মানুষে যখন পৃথক, তখন অধিকারও পৃথক হতে বাধ্য ; সবাই যখন সমান নয়, অধিকারও সমান হতে পারে না। সিংহই পশুরাজ, খরগোশ নয়। একই ভাবে, সমাজের মধ্যে যারা সিংহ তথা শ্রেষ্ঠ মানব, তারাই 'প্রভুর জাত', বাদবাকি সব 'দাসানুদাস'-আনুগত্যই ওদের প্রাকৃতিক ধর্ম, স্বাধীন চিন্তা মহাপাপ। তত্ত্বটিকে তাজা রাখার জন্যে চতুর স্বার্থবাদীরা অনেক ছলবল আবিষ্কার করেছে, সমাজের দোহাই দিয়েছে, অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাসকে খুঁচিয়ে তুলেছে, শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের ছদ্মবেশও ধারণ করেছে, যার ফলে, বিংশ শতকের তথাকথিত জাতক-কথাকে প্রথম নজরে বিজ্ঞান-ভিত্তিক বলে মনে হয়। মনে হয়, বুঝি বা নৃবিজ্ঞান-জীববিজ্ঞান-উত্তরাধিকার তত্ত্ব ইত্যাদির সমূহ সমর্থন আছে এর পেছনে। কিন্তু তা যে নয়, সিংহ-খরগোশ উপমাই তার প্রমাণ। যত ছোটই হোক, খরগোশ কখনও সিংহের ক্রীতদাস নয়, প্রজা তো নয়ই ; বরং গল্পের সেই অহংকারী সিংহ 'শশকেন নিপাতিত' হয়েছিল। তা ছাড়া, বনের পশুসমাজ এবং গ্রাম-শহরের মানবসমাজ কদাপি সমান্তরাল নয়। মানুষ খাদ্য 'তৈরি' করে, রাজনীতি করে, ধর্মচর্চা করে ; পশু না যায় স্কুলে, না বানায় শিককাবাব, না দেখে টিভি! কিন্তু কে কান দেয় এসব তথ্যে-তর্কে।

মেজর মর্টন যেমন বলেছেন 'ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, জাতিতে-জাতিতে, নেশনে-নেশনে সংঘাতের একটি বড় কারণ—ভুল বোঝাবুঝি। একটু মাথা ঠাণ্ডা করে, একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা যদি করে, তা হলে দেখতে পাবে, ঘটনা যতটা খারাপ মনে হয়েছিল, ঠিক ততটা নয়' (১৯২০)। হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও এই কথা একদা বলেছিলেন। এটা একটা কারণ, এই পরস্পর অপরিচয়, মূল কারণ নয়। সেখানে ঘাঁটি বানিয়ে বসে আছে কায়েমি স্বার্থ। অনেকে বলেছেন আইন-কানুন পরিবর্তনের-পরিবর্ধনের কথা, এতেও তাই কোনও ফল হবে না। ঘা মারতে হবে

ওই স্বার্থের কেন্দ্রবিন্দুতে, শোষণ-প্রথাকে খতম করতে হবে। দারিদ্র্য আপনিই বিলুপ্ত হবে। তার জন্য বদলাতে হবে পরিবেশকে— যে পরিবেশে বর্ণবৈর-জাতিবিদ্বেষ-সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ জন্মায়। বিষবৃক্ষের একটি বীজ-ভয়। দারিদ্র্যের ভয়, যুদ্ধের ভয়, নিরাপত্তার অভাবের ভয়, ইজ্জত হারাবার ভয়, ঐশ্বর্য ক্ষয়ে যাবার ভয়...। এই সমস্ত ভয় দূর করে স্বস্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করতে না পারলে জাতিবিদ্বেষ কোনও-না-কোনও-রূপে-বিরূপে টিকে থাকবেই।

আধুনিক শিক্ষার কথা বলেছেন অনেকে, যার আলোকে উপলব্ধ হবে। মানুষের গোষ্ঠী-কে-গোষ্ঠী নিঃসীম ভাল' বা 'সীমাহীন মন্দ'— এসব উদ্ভট ধারণা এখনই ঝেড়ে ফেলা দরকার। গরিবিয়ানা কমজোরী, গায়ের রং কিংবা অতীত-দাসত্ব, এর যে কোনওটারই দোহাই দিয়ে মানুষকে পায়ের নিচে দাবিয়ে রাখা— এই মনোভাব এবং সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম, বিজ্ঞান-মানবতাবোধ-গণতান্ত্রিক বিশ্বাস কোনও যুক্তিতেই সমর্থন করা যায় না। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সত্য বলে মেনে নিতেই হবে; তাকে বুঝতে ও বিচার করতে হবে, নিন্দা বা প্রশংসা নয়। এই প্রসঙ্গে এও মনে রাখা দরকার— জাতি/সমাজ/ব্যক্তিগত অসাম্যের সরল স্বীকৃতি অথবা এদের বাস্তবমুখী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-দুটোর কোনওটাই জাতিদ্বেষের অভিব্যক্তি নয়। জাতিবিদ্বেষ তখনই জন্ম নেয়, যখন বিশ্বাস করা/করানো হয়: এই অসাম্য অজয় অমর অক্ষয় অব্যয়। বাস্তব পরিপার্শ্বের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই, আছে শুধু জাতকের ও জাতকপত্রের সর্বাঙ্গে। এবং জাতিবিদ্বেষ তখনই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, যখন একে ব্যবহার করা হয় আত্মস্বার্থে, আর্থিক-রাজনীতিক প্রয়োজনে। জাতীয়তাবোধ তখন এক উন্মত্ত রূপ নেয়, 'সশস্ত্র শান্তি'র উদ্বেগ ছেয়ে থাকে আকাশ বাতাস। পরিবেশ বদল, যাবতীয় অসাম্যের বিলোপ, দারিদ্র্যের ক্ষয়, শোষণের সমাধি, এবং সেই সঙ্গে মানস পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে জাতিবিদ্বেষ নামক বোধটি যেদিন দূরীভূত হবে, সেদিন মানুষে মানুষে সমঝোতা/আত্মীয়তাও উপনীত হবে আন্তর্জাতিকতার এক নতুনতর উন্নততর পর্যায়ে। মাটির বুকে সেদিন নেমে আসবে স্বর্গ।

## ২৩.৯ চতুর্থ অংশের সারাংশ

ভাষা এবং জাতি দুটি স্বতন্ত্র ধারণা। এই দুটিকে এক করে দেখার যে কোনও যুক্তি নেই তা ম্যাক্সমূলর এবং অন্যান্য পন্ডিতেরা স্বীকার করেছেন। একই ভাষা-ভাষীদের যুক্তিগতভাবে একই জাতি বলা চলে না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমেবিকা যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকার অধিবাসীদের মাতৃভাষা ইংরেজি কিন্তু এরা কখনই এক জাতের নয়। আবার, একই মহাজাতি অথবা নেশনের মধ্যে একাধিক জাতি থাকতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপের নানান জাতি আছে, নিগ্রো এবং রেড ইন্ডিয়ানও আছে। এই

অবস্থায় বিশুদ্ধ জাতি শুধু একটি কল্পনা মাত্র। পন্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন যে বিশুদ্ধ আর্যজাতির লোকের সাক্ষাৎ আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি। বর্ণ বিদ্বেষের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক নয়। এটা রাজনৈতিকদের হাতে একটা হাতিয়ার মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার আগে আর্যামির নেশা হিন্দু ভারতীয়দের মনে রাজনৈতিক হীনমন্যতা চাপা দেওয়ার একটা অস্ত্র হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই আর্যামির গোঁড়ামির তীব্র নিন্দা করেছিলেন। নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হলে নিজেদের ইতিহাস এবং পরিবেশকে যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বুঝতে হবে-অপরকে বোঝাতে হবে কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের জাল ছিঁড়ে না ফেলতে পারলে কালান্তর ঘটবে না।

---

## চতুর্থ অংশের অনুশীলনী—৪

---

**নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ৬৪ পাতার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।**

**১) নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। সঠিক উত্তরটি ডান দিকে দেওয়া চারটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক) ভাষা ও জাতি
- (১) একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।
- (২) সমার্থক শব্দ।
- (৩) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারণা
- (৪) ওপরের তিনটির কোনওটাই নয়।

খ) আর্যভাষা পরিবার
- (১) একটি নিছক কল্পনা মাত্র।
- (২) ভাষাবৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত সত্য।
- (৩) শুধু আর্যদের আদি ভাষা।
- (৪) সব ভারতীয়দের আদি ভাষা।

গ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে
- (১) নানান জাতির লোক আছে।
- (২) শুধু ইউরোপীয় জাতির লোক আছে।
- (৩) শুধু শ্বেতাঙ্গরা থাকেন।
- (৪) এমন লোকেরাই খালি বাস করেন যাঁদের আদি ভাষা ইংরেজি ছিল।

ঘ) চেহারা এবং দেহের মাপজোক নিয়ে
- (১) বিশুদ্ধ জাতি খুঁজে বার করা যায়।
- (২) এক জাতি থেকে আরেক জাতির পার্থক্য নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়।
- (৩) কোনও জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।
- (৪) নির্ভুললভাবে জাতি নির্ণয় করা যায় না।

ঙ) বর্ণভেদ

(১) ধর্মভিত্তিক তথ্য।

(২) অবৈজ্ঞানিক ধারণা।

(৩) ঐতিহাসিক সত্য।

(৪) অপরিবর্তনীয়।

**২) নিচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (X) চিহ্ন দিয়ে দেখান।**

| | ঠিক | ভুল |
|---|---|---|
| ক) আর্যামির নেশায় বুঁদ হিন্দু ভারতীয়রা যে জাতীয়তার জন্ম দিয়েছিল তাতে মুসলমান এবং হরিজন হিন্দুদের জন্য সমান জায়গা ছিল। | ☐ | ☐ |
| খ) বনের পশু সমাজের নিয়মকানুন এবং গ্রাম শহরের মানবসমাজের নিয়ম কানুন কখনও সমান্তরাল হতে পারে না। | ☐ | ☐ |
| গ) জর্মনরা বিশুদ্ধ জাতি গড়ে তুলতে পেরেছিল বলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। | ☐ | ☐ |
| ঘ) বর্ণ-জাতিবিদ্বেষ-সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির শেষ না করতে পারলে সমাজের অবনতি নিশ্চিত। | ☐ | ☐ |
| ঙ) জাতি/সমাজ/ব্যক্তিগত অসাম্যের সরল স্বীকৃতি অথবা এদের বাস্তবমুখী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-দুটোর কোনওটাই জাতিদ্বেষের অভিব্যক্তি নয়। | ☐ | ☐ |

## অনুশীলনী— ৫ (ভাষা দক্ষতা বিষয়ক)

**নিচের প্রশ্নগুলির করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ৬৪ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।**

**১) একক ৮-এ আমরা দেখেছি যে মূল-শব্দের সঙ্গে 'ইক' প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্য শ্রেণীর শব্দকে হয় আরেকটি বিশেষ্য শ্রেণীর শব্দে অথবা বিশেষণ শ্রেণীর শব্দে পরিবর্তিত করা যায়। যেমন নৃতত্ত্ব + ইক= নৃতাত্ত্বিক। মূলপাঠের চারটি ভাগ থেকে এই রকম আরও দশটি উদাহরণ খুঁজে বার করুন।**

ক) + ইক =

খ) + ইক =

গ) + ইক =

ঘ) + ইক =

ঙ) + ইক =

চ) + ইক =

ছ) + ইক =

জ) + ইক =

ঝ) + ইক =

ঞ) + ইক =

**২) নিচে দেওয়া শব্দগুলিতে প্রত্যয় যোগ করে যে সব শব্দ তৈরি করা যায় তা মূলপাঠের থেকে**

**খুঁজে বার করুন।**

ক) উচ্চারণ + =

খ) নিষেধ + =

গ) চিহ্ন + =

ঘ) স্পেন + =

ঙ) বিরোধ + =

চ) ব্যবহার + =

ছ) আর্য + =

জ) গোঁড়া + =

ঝ) প্রমাণ + =

ঞ) সঞ্চার + =

ট) আত্মীয় + =

ঠ) অভিজাত + =

ড) আবিষ্কার + =

ঢ) গরিব + =

ণ) দাস + =

**৩) নিচে মূল পাঠ থেকে নেওয়া কয়েকটি সন্ধিযুক্ত শব্দ দেওয়া হল। সন্ধি বিচ্ছেদ করুন।**

ক) পরমাত্মীয় + =

খ) নিরবধি + =

গ) রূপান্তর + =

ঘ) উত্তরাধিকারী + =

ঙ) বর্ণাভিমানী + =

চ) নির্ভেজাল + =

ছ) তেজোদৃপ্ত + =

জ) জাত্যাভিমান + =

ঝ) নিশ্চিহ্ন + =

ঞ) শ্বেতাঙ্গ + =

**৪) নিচে দেওয়া শব্দগুলির সমাস ভেঙে (একক ৯-এর অনুশীলনী দেখুন) তাদের অর্থ লিখুন।**

(ক) সৎধর্ম

(খ) ক্রীতদাস

(গ) গাত্রবর্ণ

(ঘ) পশুসমাজ

(ঙ) বিশ্ববিখ্যাত

## ২৩.১০ নির্বাচিত পাঠ

সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে বেশ কিছু বাংলা বই রয়েছে। বিনয় ঘোষের পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি এবং নারায়ণ সান্যালের দন্ডক শবরী পড়ে দেখুন। এ ছাড়া এই সব বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা সম্ভব হলে সংগ্রহ করে পড়ুন।

## ২৩.১১ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী—১

১) (ক) √; (খ) √; (গ) X; (ঘ) X; (ঙ) √; (চ) X; (ছ) √; (জ) X; (ঝ) √; (ঞ) X;

**অনুশীলনী—২**

ক) √; খ) X; গ) √; ঘ) X; ঙ) X;

**অনুশীলনী—৩**

**(ক)** √; (খ) X;(গ) X; (ঘ) √; (ঙ) X; (চ) X; (ছ) √; (জ) √; (ঝ) X; (ঞ) X;

**অনুশীলনী—৪**

১) ক. ৩; খ. ২; গ. ১; ঘ. ৪; ঙ. ২;

২) ক) X; খ) √; গ) X; ঘ) √; ঙ) X;

**অনুশীলনী— ৫**

(১)

ক) সমাজ+ইক = সামাজিক
খ) অর্থনীতি+ইক = অর্থনৈতিক
গ) রাজনীতি+ইক = রাজনৈতিক
ঘ) সংস্কৃতি+ইক = সাংস্কৃতিক
ঙ) দর্শন+ইক = দার্শনিক
চ) জীব+ইক = জৈবিকক
জ) প্রত্যহ+ইক = প্রাত্যহিক
জ) প্রত্নতত্ত্ব+ইক = প্রত্নতাত্ত্বিক
ঝ) প্রকৃতি+ইক = প্রাকৃতিক
ঞ) বিজ্ঞান+ইক = বৈজ্ঞানিক

(২)

ক) উচ্চারিত
খ) নিষিদ্ধ
গ) চিহ্নিত
ঘ) স্পেনীয়
ঙ) বিরোধী
চ) ব্যবহৃত
ছ) আর্যামি, আর্যত্ব
জ) গোঁড়ামি
ঝ) প্রমাণিত
ঞ) সঞ্চারিত
ঝ) আত্মীয়তা
ঠ) অভিজ্ঞতা
ট) আবিষ্কৃত
ড) গরীবীয়ানা
ণ) দাসত্ব।

(৩)

ক) পরম+আত্মীয় - পরমাত্মীয়

খ) নিঃ+অবধি - নিরবধি

গ) রূপ+অন্তর - রূপান্তর

ঘ) উত্তর+অধিকারী - উত্তরাধিকারী

ঙ) বর্ণ+অভিমানী - বর্ণাভিমানী

চ) নিঃ+ভেজাল - নির্ভেজাল

ছ) তেজঃ+দৃপ্ত - তেজোদৃপ্ত

জ) জাতি+অভিমান - জাত্যাভিমান

ঝ) নিঃ+চিহ্ন - নিশ্চিহ্ন

ঞ) শ্বেত+অঙ্গ - শ্বেতাঙ্গ

৪) ক) সৎধর্ম= যে ধর্ম সৎ সেই ধর্ম।

খ) ক্রীতদাস— যাকে দাসরূপে কেনা হয়েছে সে।

গ) গাত্রবর্ণ— গাত্রের বর্ণ অর্থাৎ গায়ের রং।

ঘ) পশুসমাজ— পশুদের সমাজ।

ঙ) বিশ্ববিখ্যাত— যা সারা বিশ্বে বিখ্যাত তা।